এই বইয়ের মালিক:

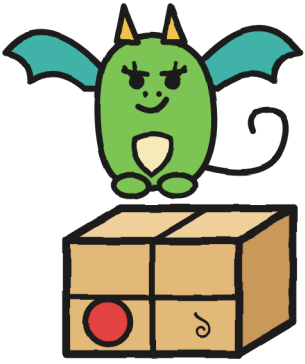
_____

আর অন্য কারও না। -হু.

অসম্ভব ডেলিভারি · ১

এই পার্সেলটা কামড়ায়

Lui Eriksson



সাইজ XL · সচিত্র উপন্যাস · ১৩+

অসম্ভব ডেলিভারি ১
এই পার্সেলটা কামড়ায়

লেখা ও ছবি: Lui Eriksson

বাংলা সংস্করণ: LinguAula

সাইজ XL · সচিত্র উপন্যাস · ১৩+

প্রথম সংস্করণ: ২০২৬

© ২০২৬ Lui Eriksson · info@linguaula.com

ক্লাসের জন্য আর বাড়ির জন্য নির্দ্বিধায় ফটোকপি করা যাবে।

ফন্ট: Andika, Patrick Hand, Caveat, Courier Prime, Atma, Galada ও Hind Siliguri (SIL OFL লাইসেন্স)।

প্রতিটা অধ্যায় অনুশীলন করো:
linguaula.com



অধ্যায় ১

যেটা পৌঁছে দেওয়া যায় না

এই খাতাটা বেরিয়েছে বাড়ি বদলের ১৪ নম্বর বাক্স থেকে। বাক্সের গায়ে মোটা মার্কারে লেখা ছিল রান্নাঘর, তাড়াহুড়ো-করা কোনো মানুষের হাতের লেখায়। ভেতরে একটা চামচও ছিল না: ছিল শুধু এই খাতাটা, একটা মোজা আর রাবারের একটা ব্যাঙ, যেটা কারও না। মাকে আমি জিজ্ঞেস করেছি। ব্যাঙটাকেও জিজ্ঞেস করেছি। ওটার দাবিদার কেউ নেই।

খাতাটার দাবি অবশ্য আমি করেছি। প্রথম পাতায় আমি ওর নাম লিখে দিয়েছি, বড় বড় অক্ষরে, যাতে শুরু থেকেই সব পরিষ্কার থাকে:

ডেলিভারির খাতা, গুনির। ব্যক্তিগত।

"ব্যক্তিগত" মানে আগে আমি পড়ব। -হু.

আমি যখন "ব্যক্তিগত" লিখেছিলাম, তখন ওই সবুজ নোটটা ছিল না। সবুজ নোটগুলোর কোনোটাই ছিল না। ওগুলো বসিয়ে যাচ্ছে হুলিতা, যে মাত্র একদিনেই আমার খাতা আমার আগে পড়ার অভ্যেস করে ফেলেছে, আর মাঝে মাঝে আমি লেখারও আগে। কিন্তু সে কথা পরে। ক্রম ধরেই এগোই।



আমরা এসেছিলাম এক মঙ্গলবার। আজ শনিবার। চার দিন হলো এই পাড়ায় আছি, আর একটা পুরো রাস্তা আমার চেনা হয়ে গেছে: আমার নিজেরটা। তাতে ছয়টা বাড়ি, আর চারপাশে প্রশ্নচিহ্ন।

বাড়ি বদলাতে চাই কি না, কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করেনি। ঠিক করেছে বড়রা, রান্নাঘরে, ওই গলায়, যে গলায় তারা এমন সব বিষয়ে কথা বলে যা আগেই ঠিক হয়ে গেছে; আর মা ব্যাপারটাকে বলল "একটা সুযোগ", বড়রা যেমন সেই জিনিসকে বলে, যা ফেরত দেওয়া যায় না।

সবচেয়ে বেশি লেগেছিল নিজের ঘর ছেড়ে আসা না। লেগেছিল ট্রাকে বসে নিজের সম্পর্কে এমন একটা কথা জেনে ফেলা, যেটা আগে জানতাম না: জীবনে আমি কখনও একটা বন্ধু বানাইনি। বন্ধু আমার ছিল। দুটো এক কথা না। আমার পুরোনো পাড়ায় বন্ধুরা আসত কারখানা থেকে তৈরি হয়ে: তিন বছর বয়সে পার্কে বালতি আর বেলচার সঙ্গে তোমার হাতে তুলে দেওয়া হতো, তারপর আর কিছুই করার থাকত না। পদ্ধতিটা আমি কখনও শিখিনি। স্কুলে দশমিক দিয়ে ভাগ করতে শেখায়, কিন্তু বন্ধু বানাতে শেখায় না: ধরেই নেওয়া হয়, তুমি ওদের সঙ্গে নিয়েই আসো।

তাই আমি তা-ই করলাম, যা কোনো কাজ না পারলে আমি করি: একটা প্ল্যান বানালাম।

বন্ধু বানানোর আমার প্ল্যান:

১. হ্যালো বলা।
২. ইন্টারেস্টিং কিছু বলা।
৩. ???

আমি ২ নম্বরে আটকে গেলাম। ৩ নম্বরের কোনো ধারণাই ছিল না। টানা তিন দিন আটকে রইলাম। তখনও জানতাম না যে তিনটের মধ্যে ৩ নম্বরটাই সবচেয়ে সোজা, আর ওটা তিনটে শব্দেই ধরে যায়।

আমার নতুন ঘরটাও কোনো সাহায্য করছিল না। ঘরটা বন্ধ বাক্সে ঠাসা, আর তাতে আমার নিজের বলে কিছু নেই; তাই আমি সেখানে ঘুমোই হোটেলে যেভাবে ঘুমোয় মানুষ: ধার করা জায়গায়, হাতের কাছে জামাকাপড় রেখে। সেজন্যই আজ সকালে আমার জানালার সামনে দিয়ে যা উড়ে গেল, তাতে আমার ঘুম এত তাড়াতাড়ি ভেঙে গেল।

ওটা একটা পার্সেল ছিল।

আমি যেমন ঘটেছিল তেমনই বলছি, কারণ ঘটেছিল ঠিক তা-ই। জুতোর বাক্সের মাপের কার্ডবোর্ডের একটা পার্সেল, একপাশে লাল সিলমোহর, আমার জানালার উচ্চতা দিয়ে উড়ে গেল, কোনো তাড়া ছাড়া, যেন নিজের কাজে যাচ্ছে। তারপর গেল আরেকটা। তারপর আরও একটা। নয়টা পার্সেল সারি বেঁধে, হাঁসের মতো, রাস্তা পার হয়ে একটার পেছনে একটা উল্টোদিকের দোকানের ডাকবাক্স দিয়ে সুড়ুৎ করে ঢুকে গেল। (বাকি এগারোটা, পরে জেনেছি, আগেই ফিরে এসেছিল, যখন আমি ঘুমোচ্ছিলাম।)

দোকানটার সাইনবোর্ডে লেখা: অসম্ভব ডেলিভারি। তার নিচে, ছোট অক্ষরে: "যা কেউ পৌঁছে দেয় না, আমরা তা-ই পৌঁছে দিই।" আর তার নিচে, আরও ছোট অক্ষরে, যেন পরে আরেকটু ভেবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে: "(প্রায় সব সময়)"।

২ নম্বর ধাপ আমার তৈরিই ছিল: "আমি পার্সেল উড়তে দেখেছি।"

ওটা ইন্টারোস্টিং না। এমন তো হরদম হয়।

ওই নোটটা লিখেছে হুলিতা। ওর সঙ্গে আমার আলাপ আজ সকালেই, উল্টোদিকের দোকানে। ও সবুজ কালিতে লেখে, আর সবুজ কালিতে যা লেখে, তা মোছে না। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি: ইরেজার দিয়ে, থুতু দিয়ে, আর সোয়েটারের হাতা দিয়ে, ওই ক্রমে। ইরেজারটাই ক্ষয়ে গেল। সবুজটা না।

আমি রাতের পোশাকের ওপরেই ডোরাকাটা সোয়েটারটা চাপিয়ে রাস্তা পার হলাম। মানে, রাতের পোশাক পরেই। ঘরে পরার জুতো পায়ে। কিছু সিদ্ধান্ত শরীর নিয়ে ফেলে, মাথা টের পাওয়ার আগেই।



ভেতরে কার্ডবোর্ডের গন্ধ, আর পোড়া কিছুর গন্ধ, যেমন মোমবাতি নেভানোর পর হয়। বাঁ দিকে একটা তাক, ওপরে লাল সাইনবোর্ড: ফেরত; আর তাকে বিশটা পার্সেল, ১ থেকে ২০ নম্বর লেখা, প্রতিটার গায়ে নিজের সিলমোহর। সামনে বেগুনি টুপি-পরা এক জাদুকরী ওগুলো একটা একটা করে দেখাচ্ছিলেন। তাঁর পাশে সবুজ ডাঙ্গারি-পরা একটা মেয়ে জোরে জোরে গুনছিল:

“...আঠারো, উনিশ, বিশ।”

“সবাই ফিরে এসেছে,” জাদুকরী বললেন। “আবার।”

কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করল না আমি কে, কিংবা কেন রাতের পোশাক পরে আছি। কোনো দোকানে এটা নিজেই অদ্ভুত ব্যাপার। অথচ ওই দোকানে এটা সেদিন সকালের সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপারও ছিল না।

জাদুকরীর নাম মারা। ওঁর আছে অসম্ভব ডেলিভারির একটা দোকান, আর একটা জ্বলজ্বলে সিলমোহর: সেটা ছাপ দিলে ছোট ছোট ফুলকি ছিটকে ওঠে, আর ফুলকিগুলোর গন্ধ ওই পোড়া জিনিসটার মতো। কীভাবে কাজ হয়, হুলিতা আমার নিজের খাতাতেই বুঝিয়ে দিয়েছে, তীর-ভরা একটা ছবি এঁকে; সেটা আধ পাতা জুড়ে, তাই এখানে সংক্ষেপে লিখছি:

- পার্সেল + সিলমোহর।
- যে নেবে, সে কি সই করেছে, এমন কালিতে, যা মোছে না?
- হ্যাঁ: পৌঁছে গেছে।
- না: ভোর হলে পার্সেলটা উড়ে ফিরে যায় নিজের তাকে।

এভাবে কোনো পার্সেল হারায় না। পৌঁছায়ও না।

তাকের পার্সেলগুলো ফেরত আসা পার্সেল: বিশটা, যেগুলো কেউ কখনও পৌঁছে দিতে পারেনি। আর সবকটাই পাঠিয়েছেন একই মানুষ। প্রতিটা লেবেলে, একই জায়গায়, একই চাপা হাতের লেখায় লেখা ছিল: প্রেরক: র.

"র. কে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"এমন একজন, যার হাতের লেখা খুব খারাপ," মারা বললেন।

আর কিছু না। কথাটা উনি এমনভাবে বললেন, যেভাবে বলা হয় সেই কথা, যা আগে বহুবার বলা হয়ে গেছে: তাকের দিকে না তাকিয়ে, দেয়ালের এমন একটা জায়গার দিকে তাকিয়ে, যেখানে দেখার মতো কিছুই ছিল না। হুলিতা ওঁর সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট নাড়ল। উত্তরটা ওর মুখস্থ, আর আমার মনে হলো, ওর কাছেও ওটা যথেষ্ট না।

মারা উনিশটা ফেরত পার্সেল ভরলেন বিশাল একটা বস্তায়, যেটা কাঁধে ঝুলিয়ে বইতে হয়। সেই রাতে ওঁকে এক বাতিঘরে একটা পিয়ানো পৌঁছে দিতে হবে, বহু দূরে, আর যেহেতু বেরোচ্ছেনই, যেতে যেতে সবগুলো আরেকবার চেষ্টা করবেন। ফিরবেন ভোরে। কথাটা উনি বললেন কোনো আশা ছাড়াই, অভ্যেসের বশে শুকনো গাছে জল দেওয়া মানুষের গলায়।

তাকে রয়ে গেল শুধু একটা। সারির প্রথমটা। ১ নম্বর।

"ওটা পৌঁছে দেওয়া যাবে না," মারা বললেন, আর আমার মনে হলো কথাটা উনি আমাদের বলছেন না। "নিয়ম একটাই: তাকটা ছুঁয়ো না।"

"অবশ্যই," হুলিতা বলল।

আমি ওর পেছনে ছিলাম, আর দেখলাম পিঠের দিকে ওর আঙুল ক্রস করা। আমি কিছু বললাম না। এখন ভেবে দেখছি, ওটাই ছিল আমাদের প্রথম ভাগ করে নেওয়া জিনিস: দু সেকেন্ডের একটা গোপন কথা, আমরা একে অন্যের নাম জানার আগেই।

হুলিতা শনিবারগুলোয় দোকানে থাকে। আমি ওকে জিজ্ঞেস করিনি ও মারার কে হয়: ভাইঝি, সহকারী, শাস্তি। কিছু প্রশ্ন দ্বিতীয় দিনে করতে হয়।

এখন তো দ্বিতীয় দিন। জিজ্ঞেস করো। –হু.



দরজা বন্ধ হওয়ামাত্র হুলিতা আমাকে আপাদমস্তক দেখল। ধীরেসুস্থে। যেমন কেউ পার্সেল দেখে ঠিক করে ওটা সিলমোহরের যোগ্য কি না।

"তুমি ডেলিভারি করতে জানো?"

এখানে আমাকে সৎ হতে হবে, কারণ এই খাতাটা ব্যক্তিগত, আর হুলিতা যেভাবেই হোক ওটা পড়বে।

সত্যি বলতে, সারা জীবনে আমি একটাই জিনিস পৌঁছে দিয়েছি: দোতলার প্রতিবেশীর খবরের কাগজ, এক রবিবার, কারণ ওটা সদর দরজার সামনে পড়ে ছিল আর আমার মনে হয়েছিল একজন বীরের দরকার। আমি ওটা ওঁর কুকুরকে দিয়েছিলাম। কুকুরটা ওটা খেয়ে ফেলল। আমার ক্যারিয়ার এখানেই শেষ।

আর আমি সেটাই বললাম, যা বন্ধু পেতে চাইলে মানুষ বলে:

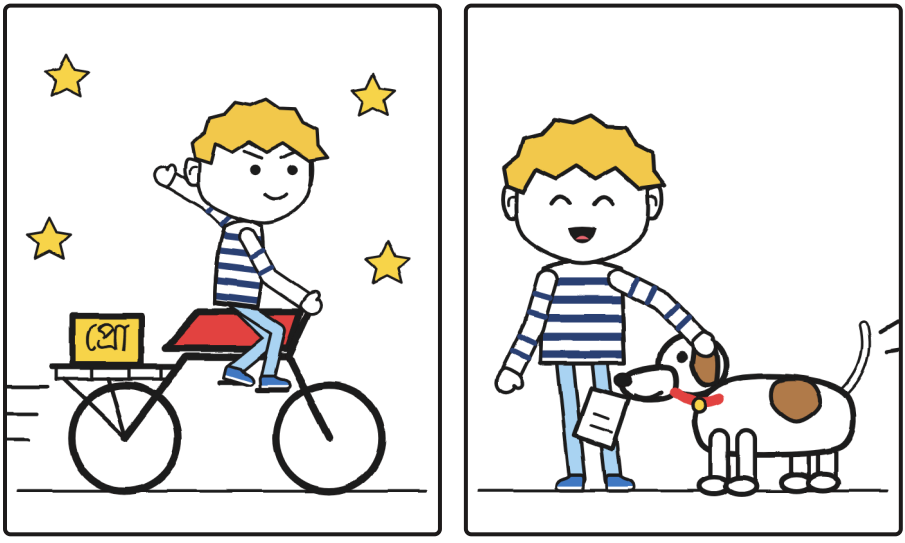
"হ্যাঁ। আমার পুরোনো পাড়ায় আমি প্রফেশনাল ডেলিভারি-বয় ছিলাম।"

যাচ্ছেতাই প্রফেশনাল।

মিথ্যে হলো সিলমোহর-মারা পার্সেলের মতো: দিব্যি মর্যাদার সঙ্গে উড়ে যায়, মাটি না ছুঁয়ে রাস্তা পার হয়, আর কোনো এক সময় ফিরে আসে। তখন আমি জানতাম না, এটা কবে ফিরবে, কিংবা কে ওটা জোরে পড়ে শোনাবে।

হুলিতা আমার কাছে প্রমাণ চাইল না। সোজা তাকের কাছে গিয়ে একমাত্র যে পার্সেলটা বাকি ছিল, সেটা নামিয়ে আনল: ১ নম্বর। যেটা পৌঁছে দেওয়া যায় না। ওর হাত একটু কাঁপছিল, কিন্তু ভয়ে না, অন্তত শুধু ভয়ে না: ওই কাঁপুনিটা তার, যে অনেক

ম্যাচ বেঞ্চে বসে কাটিয়েছে, আর শেষে কোচ তার নাম ধরে ডাকলেন। আমার হাতও কাঁপছিল, তবে আমি লুকোচ্ছিলাম ভালো: ধরা পড়ছিলাম শুধু এতে যে সোয়েটারটা আমি উল্টো পরে ফেলেছিলাম।

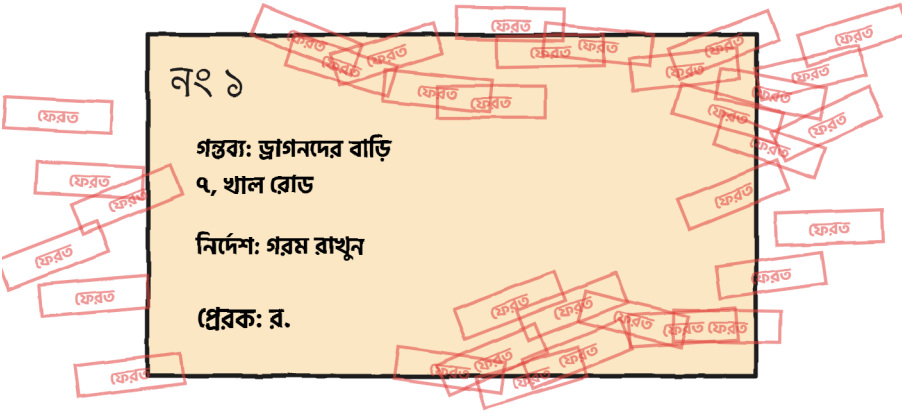


আমি ফেরত সিলমোহরগুলো গুনলাম। সাঁইত্রিশটা। লেবেলটা ছিল লেবেলের চেয়ে সিলমোহরই বেশি।

ওই সমস্ত লালের নিচে, কারও যদি জানতে ইচ্ছে হয়, লেখা ছিল:

- গন্তব্য: ড্রাগনদের বাড়ি, ৭, খাল রোড।
- নির্দেশ: গরম রাখুন।
- প্রেরক: র.

“আমরা যদি এটা ভোরের আগে পৌঁছে দিই,” হুলিতা বলল, “মারা দেখবেন যে ফেরত পার্সেলও আমি পৌঁছে দিতে পারি।”



“আর যদি না পারি?”

“না পারলে ওটা নিজেই ফিরে আসবে, আর এখানে কিছুই ঘটেনি।”

প্‌ল্‌যানটা আমার খুব ভালো লাগল। একটা প্‌ল্‌যানের যে দুটো জিনিস থাকা দরকার, দুটোই এতে ছিল: ঠিকঠাক হলে একটা পুরস্কার, আর ভুল হলে কোনো পরিণতি না। ভেতরে যে কী আছে, তখনও আমি জানতাম না।

কেউ একটা সাইকেলের ঘণ্টি বাজাল। দুবার, যেমন কেউ এমন দরজায় কড়া নাড়ে, যেটা তার নিজের না। দোকানের কাচের জানালায় দেখা দিল হেলমেট-পরা একটা ছেলে, পিঠে হলুদ ব্যাগ, যার লেখা দোকানের ভেতর থেকেই পড়া যাচ্ছিল: বিজলি ডেলিভারি। দশ মিনিটে, নইলে বিনামূল্যে।

“অসম্ভব ডেলিভারি?” সে বলল, এমন সুরে, যে আগেও অন্য শনিবারে একই রসিকতা করেছে। “তোমরা কিছু পৌঁছে দেবে, এটাই তো অসম্ভব!”

তোনিও। ভীষণ তাড়াতাড়ি ভীষণ বোরিং জিনিস পৌঁছে দেয়।

“তাহলে আজ আমরা এটাই পৌঁছে দেব,” হুলিতা বলল, আর পার্সেলটা তুলে ধরল।

তোনিও “ড্রাগনদের বাড়ি” পড়ে এত হাসল যে ওর হেলমেটটা খুলে পড়ে গেল। সেটা গড়িয়ে দরজা পর্যন্ত গেল। ও হাসতে হাসতেই সেটা কুড়িয়ে নিল, কিন্তু যখন উঠে দাঁড়াল, তখন আর হাসছিল না।

“খাল রোডে ৭ নম্বর বলে কিছু নেই,” ও বলল। “৫ থেকে সোজা ৯। আমি জানি, কারণ আমি খুঁজে দেখেছি।”

“আর তুমি খুঁজেছিলে কেন?” হুলিতা জিজ্ঞেস করল।

তোনিও হেলমেটটা পরল। কোনো কারণ ছাড়াই আবার ঘণ্টি বাজাল, তারপর খুব জোরে প্যাডেল মেরে চলে গেল; যে প্রশ্নের উত্তর সে দিতে চায় না, তার সঙ্গে ও এমনই করে। আমার হাতে রইল দুটো তথ্য: ও ৭ নম্বর খুঁজেছিল, আর বিজলি সব ব্যাপারে অত দ্রুত না।



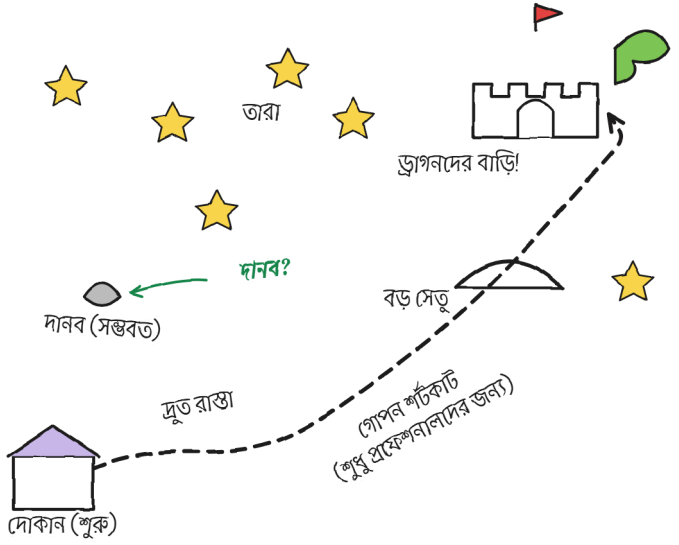
আমি ডেলিভারির একটা ম্যাপ আঁকলাম। প্রফেশনাল ডেলিভারি-বয়রা ম্যাপ আঁকে, আর আমি, কারিগরি দিক থেকে, বলেই দিয়েছিলাম যে আমি তা-ই।

ম্যাপে ছিল “দ্রুত রাস্তা”, “গোপন শর্টকাট” (শুধু প্রফেশনালদের জন্য), “বড় সেতু”, একটা “দানব” (সম্ভবত), আর ছয়টা তারা। তারাগুলোর কোনো কাজ ছিল না। আমার শুধু মনে হয়েছিল, তারা ছাড়া ম্যাপ কোনো গুরুতর ম্যাপ না।

দানবটাও রাস্তার ওপর নেই। আমি দেখে নিয়েছি। -হু.

আসল রাস্তা ধরে, যেখানে কোনো তারা ছিল না, আমরা বড় সেতু পার হলাম। দিনের বেলায় ওটা নামানো থাকে, আর সবাই পার হয়: সাইকেল, বাজারের ট্রলি টানা মহিলারা, হাঁস নিয়ে এক লোক। হুলিতা সেতুটা পার হলো ঠিক মাঝখান দিয়ে, আমাকে খুব তাড়াতাড়ি সিলমোহর আর কালির কথা বলতে বলতে, একবারও জলের

দিকে না তাকিয়ে। আমি ভেবেছিলাম, বোধহয় ও আগে বহুবার দেখেছে বলেই। ওর ডাঙ্গারির পকেট থেকে একটা বালিঘড়ি উঁকি দিচ্ছিল, যেটা ও কাউন্টার থেকে তুলে নিয়েছিল। ওটা দিয়ে ভোর হতে কতক্ষণ বাকি তা বোঝা যায় না; শুধু বালি ঝরতে দেখা যায় আর অস্থির লাগে। আমি টের পেলাম, ও এমন মানুষ, যে ডেলিভারিতে বালিঘড়ি নিয়ে যায়। আমার ভালো লাগল। আমি নিয়ে গিয়েছিলাম রাতের পোশাক।



তারাগুলো রাস্তার ওপর নেই।

৭, খাল রোড কোনো বাড়ি ছিল না। ছিল একটা দেয়াল।

তোনিও ঠিকই বলেছিল: ৫ থেকে সোজা ৯-এ যেতে হয়, আর দুটোর মাঝখানে একটা মসৃণ, ফিকে রঙের দেয়াল, কোনো দরজা নেই, জানালা নেই, ঘণ্টিও নেই। ছিল শুধু একদম নিচে, প্রায় মাটি ছুঁয়ে, ঠিক খুব ছোট কিছুর উচ্চতায়, পিতলের একটা ফলক, তাতে থাবার আকারের একটা ফোকর। ওপরে চারটে ছোট গর্ত, আর তার নিচে একটা বড়, যেন বহুকাল আগে কেউ ওখানে কিছু চেপে ধরেছিল, আর দেয়ালের গায়ে তার আকারটা রয়ে গেছে।

“হয়তো এটা একটা ডাকবাক্স,” আমি বললাম।

পার্সেলটা ঢুকল না। কাত করেও না। কোণা দিয়েও না।

দেয়ালের সঙ্গে যা যা করা যায়, সবই করে দেখলাম:

১. আঙুলের গাঁট দিয়ে টোকা দেওয়া। (কিছু না।)
২. চেঁচিয়ে ডাকা। (কিছু না, তবে আরও জোরে।)
৩. ওপর দিয়ে উঁকি দেওয়া। আমি হুলিতার কাঁধে চড়লাম, ও যতটা দেখায় তার চেয়ে শক্তিশালী, আর মাথা উঁচু করে তাকালাম। ওপাশে ছিল আরেকটা দেয়াল।
৪. হাল ছেড়ে দেওয়া। এটাই আমাদের সবচেয়ে ভালো হলো।

এক মহিলা জেরানিয়াম গাছে জল দিচ্ছিলেন, তাঁর বারান্দা থেকে আমাদের দেখছিলেন, ঝারিটা শূন্যে ধরা, যেন এই সিনেমা তিনি আগেও দেখেছেন।

“ওই পার্সেলটা বছরের পর বছর ধরে আসছে,” উনি বললেন। “যেমন আসে, তেমনই ফিরে যায়।”

কথাটা উনি বললেন কোনো খারাপ উদ্দেশ্য ছাড়াই, যেভাবে আবহাওয়ার খবর দেওয়া হয়। তারপর আবার জল দিতে লাগলেন। আমি বুঝলাম, ওই পাড়ায় একটা পার্সেল, যা পৌঁছে দেওয়া যায় না, আবহাওয়ার আরও একটা ঘটনা ছাড়া কিছু না।



ঠান্ডা পড়েছিল। শীতের আগের ঠান্ডা, সদ্য শুরু হওয়া, যেটা হাতার ভেতর দিয়ে ঢুকে পড়ে। হুলিতা আবার লেবেলটা পড়ল, নিচু গলায়, যেন শেষবারের পর ওটা বদলে গিয়ে থাকতে পারে।

“‘গরম রাখুন’। এটা বছরের পর বছর একটা বরফ-ঠান্ডা তাকে পড়ে আছে।”

আমি নতুন। কিছুতে “গরম রাখুন” লেখা থাকলে আমি সেটা গরম রাখি। আমরা নতুনরা নির্দেশ পড়ি: এটাই আমাদের একমাত্র সম্বল, কারণ কোন নির্দেশ উপেক্ষা করা যায়, তা এখনও আমরা জানি না। বাকিরা এত বছর একই জায়গায় আছে যে আর পড়ে না; ওরা জানে। আর কখনও কখনও ওরা যা জানে, তা ভুল।

আমি পার্সেলটা সোয়েটারের নিচে ঢুকিয়ে নিলাম, আমরা আবার বড় সেতু পার হলাম, আর আমি বসলাম এলিয়ার বেকারির গ্রিলের ওপর, যেখান দিয়ে ওভেনের হাওয়া বেরোয়। গ্রিলটা মাটির সঙ্গে সমান, দেয়াল ঘেঁষে, আর ওখান থেকে এক ঝলক কুসুম কুসুম গরম হাওয়া ওঠে, যেটায় পাউরুটির খোসার গন্ধ। আমি ওখানেই রইলাম, পিঠ সোজা করে, পার্সেলটা পেটের সঙ্গে চেপে, মাটিতে বসে, রাতের পোশাকে, জামার নিচে একটা বাক্স নিয়ে যতটা মর্যাদা রাখা সম্ভব, ততটা মর্যাদা নিয়ে। হুলিতা বালিঘড়িটা উল্টে দিল, আর দাঁড়িয়ে রইল, পাহারা দিচ্ছিল, মুখে কিছু না বলে।

তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে একটা পোয়াতি ডাকবাক্স।

মুখে কিছু না বলে, মানে।

আমরা অনেকক্ষণ এভাবে রইলাম। পাউরুটির গন্ধ আসছিল। আমি ঘামতে শুরু করেছিলাম। ঘামের কথা না ভাবতে আমরা কথা বললাম; কিংবা আমি বললাম, আর হুলিতা যতটুকু না বললেই নয়, ততটুকু উত্তর দিল।

“এটাই পৌঁছে দেওয়া তোমার কাছে এত জরুরি কেন?” আমি জিজ্ঞেস করলাম। “আরও উনিশটা তো আছে।”

বালি শেষ হওয়ার আগেই ও ঘড়িটা উল্টে দিল।

“কারণ গোনা আর পৌঁছে দেওয়া এক জিনিস না,” ও বলল। “আমি বহু শনিবার ধরে শুধু গুনছি।”

তারপর ও জিজ্ঞেস করল আমার পুরোনো পাড়াটা কেমন ছিল, আর আমি প্রায় সত্যিটা বলে ফেলতে যাচ্ছিলাম: যে ওখানে আমি কিছু করেছি বলে মনে পড়ে না, শুধু ওটা আমার ছিল। যে আমি ছিলাম রাবারের ব্যাঙটার মতো: তখনও নিজের কোনো

জায়গা নেই। মুখ খুললাম বলার জন্য, আর বেরিয়ে এল অন্য কিছু, একটা মেডেলওয়ালা মোটরসাইকেলের ব্যাপার। ও আমার দিকে না তাকিয়ে মাথা নাড়ল। আমার মনে হলো ও আর আমাকে বিশ্বাস করছে না। ওর তাতে কিছু এসে যাচ্ছিল না। আর ওটাই ছিল সারা সকালের সবচেয়ে ভালো ব্যাপার।

তখন কিছু একটা আমার পেটে আলতো ধাক্কা দিল। ঠক।

"ওটা কি তোমার পেট ছিল?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।

"আমার পেট ঠক করে না।"

ঠক। ঠক।

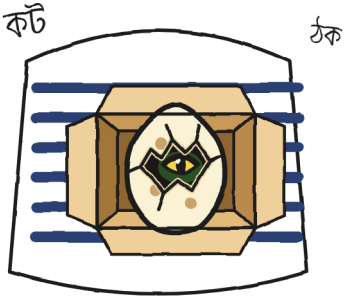
আমি সোয়েটারটা সরালাম। পার্সেলের ঢাকনার নিচে ছিল গোল, ফ্যাকাশে, ছোপ-ছোপ কিছু একটা, যেটা জুতোর বাক্স না, বাক্সে বিক্রি হয় এমন কিছুও না। ওটায় একটা ফাটল ছিল, যেটা আমি তাকিয়ে থাকতে থাকতেই বাড়ছিল।

কট।

আর পার্সেলটা আমার দিকে তাকাল।

একটা হলুদ চোখ, পুরো খোলা, ফাটলের ঠিক মাঝখানে। ও হুলিতার দিকে তাকাচ্ছিল না, যে পার্সেল সম্পর্কে সবকিছু জানে। বেকারির দিকে না, বালিঘড়ির দিকে না, আকাশের দিকেও না, যেখান দিয়ে সবকিছু ভোর হলে ফিরে আসে। আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। আর চার দিনে এই প্রথম, প্রশ্নচিহ্নে-ঘেরা বাড়ির ওই পাড়ায়, কাউকে দেখে মনে হলো সে পুরোপুরি নিশ্চিত যে আমি কে।

কেউ আমাকে সাবধান করেনি যে এমন ডেলিভারিও হয়, যেখানে পার্সেলটাই তোমাকে বেছে নেয়।


কট
ঠক

৩ নম্বর ধাপটা আমি করেছিলাম ওই শনিবার সকালে, রাতের পোশাকে, না জেনে যে ওটাই ৩ নম্বর ধাপ। কিছু সিদ্ধান্ত শরীর নিয়ে ফেলে, মাথা টের পাওয়ার আগেই; তারপর সেগুলো লিখে রাখতে মাথার এক সপ্তাহ লেগে যায়।



আজ রাতে, আমরা যখন দোকান বন্ধ করছিলাম, ফেরত পার্সেলগুলোর একটা নড়ে উঠল। সামান্যই, যেমন কেউ ঘুমের মধ্যে পাশ ফেরে। ২ নম্বরটা।

ওটা ওর জায়গাতেই ছিল, ১ নম্বরের ফাঁকের পাশে, যেটা মারা ভরেননি, হুলিতার সাইনবোর্ডের নিচে, সবুজে: বাকি ১৯। এটা কোনো হুমকি না। এটা বাজারের ফর্দ।



আমি কাছে গেলাম। হুলিতা ওটার দিকে তাকাল, যেমন কেউ পার্সেল দেখে ঠিক করে ওটা সিলমোহরের যোগ্য কি না। লেবেলে, সেই একই চাপা হাতের লেখায়, লেখা ছিল:

নং ২ · ভঙ্গুর। মেঘ ডাকার আগে খুলবেন না।

আমি দুবার পড়লাম। আমি তো নতুন: আমি সবকিছু পড়ি। আর কোথাও লেখা ছিল না যে মেঘ ডাকার অপেক্ষা নীল একটা টুলে বসে করা যাবে না।

আর বাইরে বৃষ্টি শুরু হচ্ছিল।

আমি আবহাওয়ার খবর দেখেছি। ঝড় আসছে। -হু.